



আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন



শীতকালীন সংখ্যা

পৌষ-মাঘ ১৪৩১

শেষ হয়ে এল ইংরেজি বছর। ঘনিয়ে এল শীতের বেলা । বছর শেষের এই সংখ্যায় রইল এই বেলা শেষের দিনগুলোর একটু আভাস। শীতের ওমা কলকাতায় এখন চলছে উৎসবের মরশুম। এই উৎসবের আঁচও রইল এই সংখ্যার গায়ে জড়ানো। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল পাঠক আর শুভানুধ্যায়ীদের।



## আশিস পণ্ডিত

শুরু হয়েছিল ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই সব আলটপকা মন্বব্যকারীদের অথবা ধর্মের জিগির তোলা অন্ধ লোকেদের কে বোঝাবে যে, ভারতীয় পণ্য যতো সম্ভায় এবং যতো সহজে বাংলাদেশের মানুষের হাতে পৌঁছে তা আর অন্য কোন দেশ থেকে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ থেকে আড়াই কোটি হিন্দুকে যাঁরা তাড়াবার কথা বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন তাঁরা ভুলে গেছেন যে তাঁদের ওইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্বব্য এ পারের হিন্দু মৌলবাদীদের উৎসাহিত করছে। এ পার বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মনে রাখা উচিত যে, পালটা মন্বব্য করে বাংলাদেশের হিন্দুদেরকেই আরো বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ যেসব হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু যাঁরা বাংলাদেশে এখনও বাস করছেন তাঁদের বাংলাদেশেই থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে ভারতীয় নাগরিকতা সংশোধনি আইন তৈরি করেছে সেখানে ২০১৪ সালের পর ভারতে আসা কোনো মানুষকেই ভারতের নাগরিকতা দেওয়ার সুযোগ নেই। অতয়েব বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সবাইকারই সংযত আচরণ করা উচিত।



হিসেব কিন্তু বলছে গত কয়েকদিনে কয়েক হাজার মেট্রিকটন আতপ চাল, ট্রাকভর্তি আলু পিঁয়াজ, কসমোটিকস্, ওষুধ বাংলাদেশে গেছে। আবার বাংলাদেশ থেকেও কয়েক কোটি টাকার মাছ পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। ভারতের আলু পিঁয়াজ কসমোটিকস যেমন বাংলাদেশ ছাড়া আর অন্য কোনো দেশ আমদানি করবে না, ঠিক তেমনই বাংলাদেশের ইলিশ মাছ বাঙালি ছাড়া আর কেউ খাবে না। তাই দুইদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একে অপরের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করতে দেখে হাসি পেলেও চিন্তিত হতেই হয় যখন দেখা যায় ঢাকার রাস্তায় প্রকাশ্যে দিবালোকে একদল উন্মত্ত মানুষ আইসিসের কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করছেন,

যখন দেখা যায় উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সভাতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের শেখর কুমার যাদব নামে এক বিচারপতি প্রকাশ্যে মুসলিমদের কাটামোল্লা বলে অভিহিত করছেন , যখন দেখা যায় পাকিস্তানের এক ধর্মীয় নেতা বলছেন যে পাকিস্তানের আনবিক বোমা বাংলাদেশের প্রয়োজনে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে , যখন দেখি উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার দিয়ে একটা ২০০ বছরের প্রাচীন মসজিদ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে । এই সব ঘটনা কিন্তু এই উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে খুবই চিন্তার কারণ । বামপন্থী নেতা নেত্রীরাও বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনার এবং একই সঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘুদের উপরে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন , কিন্তু তা কখনই শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেনি। আশা করা যাক অন্য অন্য দলগুলির নেতানেতৃবর্গও এই পথই অনুসরণ করবেন।



## সূচিপত্র

কৰ্পোৰেট ভজনা চলছেই - বঞ্চিত মধ্যবিত্ত, কৃষক সহ আমজনতা তাপস দে বিশ্বাস	Page 6
জৰ্জিয়ায় হামলা চালাবে রাশিয়া ? অসীম সাহা	Page 9
বাশাৰ আল-আসদের পতনের পর চেহারা বদলাবে কি সিরিয়ার তাপস দাশ	Page 12
ৰঙে রেখায় রাজপুতানা আদিত্য সেন	Page 15
অন্য ভারত কনককান্তি সরকার	Page 19
ইন্দো - ইউৰোপ উৎসব ২০২৫ - ভারত আৰু ব্ৰিটেন জুড়ে জোর প্রস্তুতি নিজস্ব প্রতিনিধি	Page 21
ফিৰে দেখা (অষ্টম পৰ্ব) প্রদীপ শ্রীবাস্তব	Page 24
ৰোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (অষ্টম পৰ্ব) বাবলু সাহা	Page 27
গৰুমাৱাৰ জঙ্গলে অনিৰ্বাণ মুখোপাধ্যায়	Page 30
মায়াবী মিশর (প্রথম পৰ্ব) ডা প্রভাত ভট্টাচার্য	Page 34
অন্য জগৎ নিজস্ব প্রতিনিধি	Page 38

## কর্পোরেট ভজনা চলছেই - বঞ্চিত মধ্যবিত্ত, কৃষক সহ আমজনতা

তাপস দে বিশ্বাস

গত পাঁচ  
বছরে আর  
কিছু না  
হলেও দশ  
লক্ষ কোটি  
কর্পোরেট ঋণ  
মকুব করে  
রীতিমতো  
নজির সৃষ্টি  
করল মোদি  
সরকার।



কিন্তু হিসেব

বলছে ইতিমধ্যে একই সময়ে দেউলিয়া হয়েছে প্রায় ৪১ হাজার স্টার্ট আপ সহ বিভিন্ন সংস্থা। এর আগেও এই জমানার প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছিল একসময়। অর্থাৎ প্রথম পাঁচ বছর এবং পরের পাঁচ বছর — অংকে কিন্তু খুব ফারাক হল না। খোদ সরকারি তথ্যই বলছে পরের এই সময়সীমায় প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ মকুব হয়েছে। কৃষি এবং সমবায়ের ঋণ কিছু আছে বটে তবে দশ লক্ষ কোটি টাকার পাহাড়ে তা নুড়ির থেকেও সামান্য বললেও কমই বলা হয়। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীপক্ষের দাবি, সরকার যা করছে তার সবটাই প্রায় ভোটের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ ভোট ব্যাংকের স্বার্থে। আর তাতেই নাভিশ্বাস উঠছে আপামর দেশবাসীর। রীতিমতো প্রোপাগান্ডা চালিয়ে নতুন ভারত কেমন আছে এই প্রশ্নের জবাব দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মোদি সরকার। তারা বলে মূল্যবৃদ্ধি নাকি নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তারপরেও মধ্যবিত্ত ঝুঁকে পড়ে ঋণের বোঝায়। ঋণে ডুবে যায় কৃষক। আন্দোলন হয়। অন্যদিকে সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকে। দাবি ওঠে



বটে কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে। কিন্তু সেই দাবি পৌঁছে উঠতে পারে না দিল্লি দরবার পর্যন্ত। ফলে অবস্থা যে কে সেই।

অথচ রমরমা বাজার কিন্তু কর্পোরেটের। হিসেব বলছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কুড়ি লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণ নাকি দিয়েছে সরকার। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের কৃষি ঋণ শোধের হার যথেষ্ট ভালো। তারপরেও কৃষকদের কোনো বাড়তি সুবিধা কিন্তু কর্পোরেটদের মতো দেওয়া হয় না। কেন দেওয়া হয় না তার কোনো জবাব নেই। কেন নেই তা নিয়ে কোনো হেলদোলও নেই। কেবল নড়ে চড়ে বসা শুরু হয় কৃষকরা নিজেদের দাবি সামনে নিয়ে এলেই।



উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল , ১৯৯০-৯১ এবং ২০০৮ - ০৯ অর্থবর্ষে যথেষ্ট না হলেও কিন্তু কৃষি ঋণ মকুব হয়েছিল । আর যোগাযোগ ২০২৩-২৪ এ সুযোগটা পেলেন অধিকাংশ টাই কর্পোরেটেরা । কৃষকদের মতো একই অবস্থা প্রায়

ছোট ব্যবসায়ীদের। গত ছয় বছরে প্রায় ৪১ হাজার সংস্থা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদন করেছে। গত ছয় মাসের সংখ্যাটা ২হাজার২৩৬। এবং সংসদে কথাটা জানিয়েছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আপনার বক্তব্য ২০১৮-১৯ থেকে চলতি বছরে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঋণের ভারে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে এই এই ৪১ হাজার সংস্থা। এই ক বছরে ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাংকরাপসি উডের আওতায় ৪০০০০৯৪৩ টি আবেদন জমা পড়েছে জাতীয় কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালে। ১হাজার ৬৮ টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকার বেশি।

যাইহোক হিসেবটা তাহলে কি বলছে ! বলছে একটাই কথা যে, লাভের গুড় আসলে খেয়ে যাচ্ছে বড় কর্পোরেটরা। দশ বছরে গরিবরা গরিব থেকে গরিবতর হয়েছে কিন্তু ফুলেফেঁপে উঠেছে ধনীরা। এবং, সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলেছে। এ লেখার শেষ করি আরেকটা তথ্য দিয়ে , ঘটনা করে মিড ডে প্রকল্পের নাম পালটে যতই পি এম পোষণ করা হোক, এই প্রকল্পে বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রের মাথাব্যথা ছিল না। দু বছর বাদে অনেক ভেবেচিন্তে তারা বরাদ্দ বাড়িয়েছে বটে, তবে অঙ্কটা নড়ে বসার মতোই : পড়ুয়া পিছু দিনে মাত্র ৭৪ পয়সা !





## জর্জিয়ায় হামলা চালাবে রাশিয়া ?

অসীম সাহা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামার নাম নেই। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পুতিনের নির্দেশে ইউক্রেনে বিশেষ ফৌজি অভিযান (স্পেশ্যাল মিলিটারি অপারেশন) শুরু করে রুশ সেনা। তার পর থেকে হাজার দিন কেটে গেলেও পূর্ব



ইউরোপে থামছে না যুদ্ধ। বরং সংঘাতের উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, এ বার অন্য একটি দেশে হামলা চালাতে পারে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের সরকার! আর সেই দেশ হল জর্জিয়া। কিন্তু কেন? এই জল্পনা শুরু হয়েছে রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভের একটি বার্তায়। টেলিগ্রামে একটি বার্তায় তিনি বলেছেন, “জর্জিয়া এখন ইউক্রেনের পথে চলছে। যদি জর্জিয়া এমন কোনও পদক্ষেপ করে, যা রাশিয়ার ভূরাজনীতির উপর প্রভাব ফেলবে, তা হলে রাশিয়াকেও পদক্ষেপ করতে হবে।” মেদভেদেভের এই বার্তাতেই হইচই পড়েছে। কিন্তু কেন এমন বার্তা দিলেন তিনি? সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার আগে রাশিয়ার সঙ্গেই ছিল জর্জিয়া। সেই জর্জিয়াতেই একটি তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, যা দেশব্যাপী বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছে। জর্জিয়ার ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ হওয়া উচিত কি না তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। বিগত পাঁচ দিন ধরে সেই বিক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে। জর্জিয়ার রাজধানীতে পাঁচ দিনের টানা বিক্ষোভের পরে ২০০ জনেরও বেশি লোককে আটক করা হয়েছে।

ওই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেও সংঘাত শুরু হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর জর্জিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে জয় পেয়েছে ‘ড্রিম পার্টি’। যদিও সেই জয় নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্কও। জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট সালামে জোরাবিচভিলি দেশটির নবগঠিত সরকারকে ‘অবৈধ’ বলে ঘোষণা করেছেন। জোরাবিচভিলির অভিযোগ, মস্কোর সহায়তায় ভোটে কারচুপি হয়েছে। বাকস্বাধীনতা নষ্ট করতে এবং নির্বাচনে কারচুপির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ‘রাশিয়ান পদ্ধতি’। অন্য দিকে, জোরাবিচভিলির পদত্যাগের দাবি তুলেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবাখিদজে। তবে জোরাবিচভিলি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘বৈধ’ সরকার গঠিত না হলে পদত্যাগ করবেন না তিনি। জর্জিয়ার সাধারণ নাগরিকদের একাংশও প্রেসিডেন্টের সুরে কথা বলছেন। সে দেশের পার্লামেন্ট বয়কটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে নবনির্বাচিত সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের আলোচনা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার নাগরিক। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আটকের সংখ্যা আড়াইশো পেরিয়েছে। উল্লেখ্য, ড্রিম পার্টির বিরুদ্ধে ‘রাশিয়া-প্রেমের’ অভিযোগ আগেও উঠেছে। তবে বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীল। যদিও জর্জিয়ার অনেক পক্ষেরই অভিযোগ, ড্রিম পার্টির সঙ্গে বিশেষ সখ্য রয়েছে রাশিয়ার। এবং নির্বাচনে কারচুপি করার জন্য দলটি রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে।

আর সেই দাবি নিয়েই রাস্তায় নেমেছেন সে দেশের মানুষ। তাঁদের দাবি, পশ্চিম দেশগুলির পথ অনুসরণ করুক জর্জিয়া। কারণ, রাশিয়ার অতীত এখনও তাঁরা ভোলেননি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই রাশিয়া এবং জর্জিয়া বিভক্ত। ২০০৮ সালে উভয় দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জর্জিয়ার কিছু ভূখণ্ড রাশিয়া নিজের বলে দাবি করার পর সেই সংঘাত বেধেছিল। সোভিয়েত পতনের পরে জর্জিয়া স্বাধীন হয়। সেই সময়ে জর্জিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দক্ষিণ অসেশিয়া প্রদেশ। পাল্টা তাদের স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করে সেনা পাঠায় জর্জিয়া। ১৯৯১-৯২ সালে যুদ্ধ বাধে। তবে সমস্যার নিষ্পত্তি হয় না। সংবিধান রচনা, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, পৃথক অর্থনীতি- নিজেদের মতো করে চলতে থাকে দক্ষিণ অসেশিয়া। ফের ২০০৪-এ যুদ্ধ। স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাহারের শর্তে দক্ষিণ অসেশিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দিতে চায় জর্জিয়া। কিন্তু দক্ষিণ অসেশিয়া গণভোট করে আলাদা হতে চায়। সেখানে সাময়িক প্রশাসন তৈরি করতে চেয়ে আইন পাশ করে জর্জিয়া। আলোচনার আন্তর্জাতিক উদ্যোগও ভেসে যায়। অন্য দিকে, সার্বিয়া থেকে কসোভোর স্বাধীনতার ফলে অসেশিয়ানদের দাবি জোরদার হয়। ক্ষমতা ভাগ করে নিতে রাজি হয় না তারা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে স্কিনভালি (দক্ষিণ অসেশিয়ার রাজধানী) মুক্ত করার কথা বলে জর্জিয়ার সরকার।

রাশিয়ার চক্রান্তের গন্ধ পায় তারা। ২০০৮-এর যুদ্ধে ঢুকে পড়ে রাশিয়া। মস্কোর সাহায্যে নিজেদের এলাকা দখল করে নেয় দক্ষিণ অসেশিয়া। জর্জিয়ার জন্য সেই অতীত ভোলার নয়। আর তাই রাশিয়াকে আপন না করে নেওয়ার দাবি তুলেছেন জর্জিয়ার বিক্ষোভকারীরা।



তবে পুরো বিষয়টিকে রাশিয়া যে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না, তা স্পষ্ট মেদভেদেভের বার্তা থেকে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভও সোমবার জানিয়েছেন, জর্জিয়ার ঘটমান পরিস্থিতি এবং ইউক্রেনের ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের ঘটনাগুলিকে সমান্তরাল ভাবে বিবেচনা করছে

রাশিয়া। ইউক্রেনের তৎকালীন রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্তের কারণে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল সে দেশে। যেমনটা এখন জর্জিয়ায় হচ্ছে। তাই কূটনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ইউক্রেনের মতো জর্জিয়ার উপরেও হামলা চালাতে পারে রাশিয়া। ছত্রভঙ্গ করতে পারে আন্দোলনকারীদের।

তবে অনেকে এ-ও মনে করছেন, প্রতিবেশী জর্জিয়া নিয়ে রাশিয়ার এত মাথা ঘামানোর কারণ অন্য। এর অন্যতম কারণ পৃথিবীর মানচিত্রে জর্জিয়ার অবস্থান। জর্জিয়ার এক পাশে কাস্পিয়ান সাগর, অন্য দিকে কৃষ্ণসাগর। কাস্পিয়ান সাগর প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভার। কৃষ্ণসাগর বিখ্যাত বাণিজ্যিক রাস্তা। আর তা হাতের মুঠোয় রাখতেই নাকি এ বার জর্জিয়ায় হামলা চালাতে পারে রাশিয়া।



## বাশার আল-আসদের পতনের পর চেহারা বদলাবে কি সিরিয়ার

তাপস দাশ

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতনের পর থেকে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহর ইজরায়েলি সেনার দাবি, গত ৪৮ ঘণ্টায় সিরিয়ার উপর সাড়ে তিনশোরও বেশি হামলা চালিয়েছে তারা। এমনকি সিরিয়ার



নৌবহরেও হামলা হয়েছে। ইজরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, সিরিয়ার আল-বায়েদা এবং লাতাকিয়া বন্দরে হামলা করেছে তারা। তাতে সিরিয়ার অন্তত ১৫টি জাহাজ ধ্বংস হয়েছে।

বাশারের পতনের পর থেকে সিরিয়ায় একের পর এক হামলায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইজরায়েলের উদ্দেশ্য নিয়ে। কারও কারও মতে, ইজরায়েল আবার গোলান মালভূমিতে ‘দখল’ পাওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও ইজরায়েলের দাবি, তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্যই হামলা চালাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদেও এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে নেতানিয়াহর প্রশাসন। তাদের বক্তব্য, এই হামলা ‘সীমিত এবং সাময়িক’।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধের পর সিরিয়ায় পতন হয়েছে বাশার আল-আসাদের শাসনের। সিরিয়ার দখল নিয়েছেন বিদ্রোহীরা। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশে তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে উদ্বিগ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে। এই আবহে বিদেশ মন্ত্রক জানাচ্ছে, সিরিয়া থেকে ৭৫ জন ভারতীয়কে ইতিমধ্যে বার করে আনা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ৪৪ জন বাসিন্দা। তাঁরা সিরিয়ার সাইদা জ়নাব অঞ্চলে আটকে পড়েছিলেন। ৭৫ জন ভারতীয়কেই সিরিয়ার সীমান্ত পার করে সংলগ্ন লেবাননে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে বিমানে তাঁদের ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস এবং লেবাননের রাজধানী বেরুটে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ তৎপরতায় তপ্ত সিরিয়া থেকে তাঁদের বার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

তবে এখনও কোনও ভারতীয় নাগরিক সিরিয়ায় আটকে রয়েছেন কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট ভাবে কিছু জানায়নি বিদেশ মন্ত্রক। তপ্ত পরিস্থিতিতে সিরিয়ায় থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দামাস্কাসের ভারতীয় দূতাবাস একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সরকারি হিসাবে সিরিয়ায় প্রায় ৯০ জন ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত।

সিরিয়ায় পরিস্থিতি তপ্ত হতে পারে বলে আঁচ করে আগে থেকেই সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক করে বিদেশ মন্ত্রক। গত সপ্তাহে এক অ্যাডভাইজরিতে সিরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশে বলা হয়, তাঁরা যেন প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোন এবং সাবধানে চলাফেরা করেন। প্রত্যেককে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়। সেই সঙ্গে সুযোগ থাকলে সিরিয়া ছাড়ার বার্তাও দেয় বিদেশ মন্ত্রক। এই পরিস্থিতির মধ্যে গত রবিবার দামাস্কাসের দখল নেন বিদ্রোহীরা। তার পর থেকে সিরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করে দূতাবাস।

সম্প্রতি সিরিয়ার বিদ্রোহীরা রাজধানী শহর দামাস্কাসের দখল নেয়। ওই তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে সিরিয়া ছাড়েন বাশার। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তিনি রাশিয়ায় সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন। বাশারের দামাস্কাস ত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিরিয়ার উপর হামলা শুরু করে ইজরায়েল। বেশির ভাগ হামলা হয়েছে সিরিয়ার সামরিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে। তালিকায় রয়েছে একটি গবেষণা কেন্দ্রও। সেখানে সিরিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে বলে সন্দেহ করা হয়। যদিও



তার কোনও প্রমাণ মেলেনি। যদিও ইজরায়েলের দাবি, ওই অস্ত্র যাতে সিরিয়ার চরমপন্থীদের হাতে না পৌঁছে যায়, সেই কারণে হামলা চালিয়েছে তারা।



ব্যাশারের পতনের পর সিরিয়াকে সামরিক ভাবে কার্যত 'পঙ্গু' করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে রাশিয়া। ব্যাছাই করে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এবং অস্ত্রভান্ডারগুলিতে হামলা সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ জানিয়েছেন, যে সব অঞ্চল ইজরায়েলের ক্ষতি করতে পারে, শুধু সেই অঞ্চলগুলিতেই হামলা চালানো হচ্ছে। সিরিয়ার নৌবহর ধ্বংস করাকেও একটি 'বড়' সাফল্য হিসাবে মনে করছেন তিনি।

ইজরায়েলের দাবি, তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই হামলাগুলি চালাচ্ছে। তবে এর নেপথ্যে গোলান মালভূমির উপর 'কজা' পাওয়ার চেষ্টাও থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইজরায়েলের দখলে চলে গিয়েছিল। পরে তা ফিরিয়ে দিলেও, একটি অংশ নিজেদের দখলে রেখে দেয় ইজরায়েল। যদিও আমেরিকা ছাড়া দুনিয়ার অধিকাংশ দেশই আংশিক দখলে থাকা গোলান মালভূমিকে ইজরায়েলের অংশ বলে মান্যতা দেয়নি। এরই মধ্যে দু' দিন আগে নেতানিয়াহ্ গোলান মালভূমিকে ইজরায়েলের অংশ বলে দাবি করেছেন। ব্যাশারের পতন হতেই আবার ইজরায়েল সিরিয়ার উপর হামলা শুরু করায় তাই নেতানিয়াহ্ প্রশাসনের অভিপ্রায় নিয়ে সংশয় জেগেছে অনেকের মনে।





## বঙে বেখায় রাজপুতানা

আদিত্য সেন

প্রায় আশি বছরের এক রাজপুত আগে এগিয়ে এল। বয়স্ক রাজপুত কেমন যেন বেমানান। বড় বড় ভুলুচুলু চোখ, উন্নত কপাল। হাসি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে- ছিল; এ বয়সেও অনেকগুলি দাঁত অক্ষত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আলেক- জাগারের আমল থেকে লোকটি উঠে এল। প্রথমেই সে অভিযোগ করল-- দিল্লী থেকে এলেন, আফিং এনেছেন? বশিষ্ঠ আশ্বাস দিল-- এবারে আনিনি, আসছে বার নিশ্চয় আনব। বুড়ো তৎক্ষণাৎ জবাব দিল-- সবাই শুধু আশ্বাস দেয়, আনে না। একমাত্র ভোটের সময় দু'একবার আফিং পেয়েছি। হেসে বলল-- ওটা না পেলে আমি ভোট দিই না।



বশিষ্ঠ জানতে চাইল, কোনটা ভাল ছিল, রাজার আমল, না এখনকার সরকার বুড়ো বলল--এখনকার শাসন ভাল কি করে বুঝব? সব ত খেয়ে শেষ করে দিল

। এরা দেশের এমন হাল করেছে যে পয়সা দিয়েও আফিং পাই না। হাসির রোল উঠল। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হালকা হলুদ ও ম্যাজেন্টা রঙের পাগড়ি পরেছে। বলল--এটা খুব পুরনো গ্রাম। নশো বছর বয়স ত হবেই। এই গ্রামের অনেক ছুতোরমিস্ত্রি দুবাই আর ওমানে চলে গেছে। তাদের এত টান যে দু'তিন বছর অন্তর একবার গ্রামে ফিরবেই।

জিনিসপত্র ভরে আনে, অনেকের জন্যই আনে। কেউ বলল--মোড়লের জন্য একটু বেশী আনে। ফোকলা দাঁতে হেসে উঠল মোড়ল ।

গোঁফওয়ালা মাস্টার মধ্যবয়সী। গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবে না। সে বলল--এটাকে বলা যায় বর্ধিশু গ্রাম। ছাগল-মোষ অনেকেরই আছে। এই গ্রামের লোকেদের কাঠের কাজের সুনাম ছিল। কাজ করার জন্য বহু কারিগর এ গ্রামে থেকে যেত। এছাড়া এরা নানারকম শাল, বালতি আর হাতের কাজের নানা জিনিস তৈরী করে। স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা।

এর বেশী পড়তে জয়সলমের-এ যেতে হয় । মেয়েদের পড়ার এখনও রেওয়াজ নেই।

বশিষ্ঠ জানতে চাইল — ছেলেদের মধ্যে পড়াশুনার রেওয়াজটা এত কম কেন ? মাস্টার বলল--পড়াশুনা করার অনেক বাধা। তাও চেষ্টা করি এদের পড়াতে, যতটা যার হয় ।

মোড়ল ফোকলা দাঁতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। বললে-- পড়বে কেমন করে? এদের জীবনে নানা বাধা। খরার সময়ে জলের জোগাড় করতে এদের সময় যায়। অল্পবয়সীদের দায়িত্ব অনেক। স্কুলে যাওয়াটা অপচয়। একটু থেমে মোড়ল আরও বলল-- সুখার দিনে ভেড়া-ছাগল নিয়ে দূর রাজ্যে পাড়ি দেয় বাচ্চারাও --মাস্টার তখন কি তাদের বাধা দেবে ? বলে দূরে স্কুলটা আঙুল উঁচিয়ে দেখাল বশিষ্ঠকে।

বশিষ্ঠ ভাবল—এটা কি সরকারী স্কুল ঘর ?

না বলে দিলে ত বোঝাই ভার। কিছু গরু আর গাধা রোদের তাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে স্কুল ঘরে দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে। মোড়ল বলল--গ্রামে এই এক সুবিধে--কারুর সঙ্গে কারুর বিরোধ নেই। ছাত্ররা যখন আসবে, গরু-বাছুর গাধাগুলোকে তাড়িয়ে দিব্যি স্কুল ঘরে বসে পড়বে। এটা একটা মস্ত গুণ। কিন্তু অবস্থাটা একবার ভাবুন, গোরু মোষ ছাগল ভেড়া নিয়ে বড়রা যখন মধ্যপ্রদেশ বা গুজরাটে যায়-- তখন ত বাচ্চাদেরও সঙ্গে যেতে হয় । ওখানকার লোকেরা আজকাল এদের যেতে দিতে চায় না, নানা রকমভাবে বাধা দেয়, এমন কি আক্রমণও করে। এরাই বা কেন ছাড়বে, হামলার জবাব দেয়। এজন্য বাচ্চাদেরও হাতে লাঠি- সোটা থাকে। কি কপাল, ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হয় মরতে।

বশিষ্ঠের মনে পড়ে গেল, মধ্যপ্রদেশের সংরক্ষিত বনের একজন অফিসার ওকে বলেছিল-  
-আরে মশায়, এরা যারা জয়সলমের অঞ্চল বা ঐ এলাকা থেকে আসে, এরা সব  
সাংঘাতিক লড়াকু ট্রাইব। 'ভেড়া ভাগাও আন্দোলন' কি শুধু ভেড়া- ছাগলের দৌরাঙ্ঘ্যে  
হচ্ছে ? হচ্ছে, তার কারণ বন্দুকের চেয়ে লোকেরা ভয় পায় গোফানের মার-কে।  
একরকমের গুলতি, বুকলেন--এরা বলে গোফান। যেমন লোকগুলোর গোঁফ, তেমনি  
গোফানের নিশানা। গণ্ডোগোল আরও এক জায়গায়। অনুমতিপত্র নেবে দশ হাজার  
ভেড়ার জন্য আর কায়দা করে বনে ঢুকিয়ে দেবে দুই লক্ষের মত। ভেড়াগুলোকে আপনি  
তাড়াতেও পারবেন না। ভীষণ প্রভুভক্ত। যেখানে প্রভু বসিয়ে দিয়ে যাবে মরে গেলেও  
নড়বে না; প্রাণ দেবে তবুও । এদের কথা শুনতে শুনতে কখন সন্ধ্যা নেমে এল, টের  
পায়নি বশিষ্ঠ। ঘোরের মধ্যে ছিল যেন। রতনু বলল--সার, এবার চলুন, আপনার  
জন্মে গান- বাজনার ব্যবস্থা করেছি।

বশিষ্ঠকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য এক বাড়িতে। ঘরে একপাশে বস্তা বস্তা ধান রাখা।  
সারা বছরের সংস্থান। বাজার থেকে নিয়ে এল বেশ ঝাল আলু- ভাজি । সঙ্গে এলাচ  
দেওয়া চা। সন্ধ্যা হতেই ভাঙ্গা একটা হারিকেন জ্বালান হল। কয়েকজন গাইতে আসছে।  
শতরঞ্জি পেতে দেওয়া হয়েছে দালান বাড়ির উঠানে। হারিকেনের আলোতে সবার মুখ  
দেখা যাচ্ছে না। ছায়া ছায়া মূর্তি আসছে যাচ্ছে, খাটিয়ায় বসছে আবার উঠে যাচ্ছে।



শিল্পীরা এল  
হারমোনিয়াম  
নিয়ে। ছোট্ট  
একটা বাঁচা  
বাজাচ্ছে খরতাল।  
গান কখন শুরু  
হবে ঠিক নেই,  
বাঁচা ছেলেটার  
আর তর সইছে  
না, খরতাল  
বাজিয়েই সে মাং

করে দেবে, এমন একটা ভাব । কালো মত একটি ছেলের হাতে ঢলি। মধ্যবয়সী  
দাড়িগোঁফওয়ালা বাজাচ্ছিল সারেঙ্গী।

বশিষ্ঠের মনে পড়ে গেল সাম যাবার পথে একবার এক লাঙ্গা যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কাঁধে ঝোলান সিন্ধি সারেঙ্গী। বশিষ্ঠ হঠাৎ পাগড়িটার দিকে নজর পড়ায় লাঙ্গা চোখের কোণে কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে বলল--কি দেখছ সার ? বশিষ্ঠ যেন নিজের মনেই বলল না, ঠিক যেন মেলাতে পারছি না। কথায় বলে, রাগ রসোই পাগড়ি, কভী কভী বন যায়। বশিষ্ঠ বলল-- তোমার ঐ সারেঙ্গীটা একটু বাজাবে ? লাঙ্গা শুধাল--কি রাগ শুনবেন ? বশিষ্ঠ বলল--সময়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এমন কিছু বাজাও, শুনি। লাঙ্গা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে মনে মনে সময়টা ঠিক করে নিয়ে সারেঙ্গীর ছড়ে টান দিল। রাগটা একটু যেন অন্যরকম। বাজাতে বাজাতে একটু থেমে লাঙ্গা বলল-- সিন্ধু-ভৈরবী, সার । বশিষ্ঠ ভাবল, তাই ত এরা ত সিন্ধু প্রদেশ থেকে এসেছে। বশিষ্ঠ জানে, গানের রাগরাগিনী এদের হাতের মুঠোয় । সময়, রঙ, কাল সব ফিরিয়ে দিতে পারে সারেঙ্গীর এক ছড়ে । ততক্ষণে গায়ক আধ-বসা অবস্থায় তান ধরেছে, তার বাঁ-হাতটা কানের ওপরে। ডান হাতটা নিবেদনের ভঙ্গীতে একটু উপরের দিকে ছড়ান । বোঝা যায় না কোনটা সারেঙ্গীর সুর, কোনটা তার গলা। মিলে মিশে একাকার। গানের কলি মনে নেই বশিষ্ঠের কিন্তু রতনু গানগুলির ভাবার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এক একটা গানের কি ভাব! বিষ্ণু কামড়েছে বউকে। ভাসুর বিষ ছাড়াবে শুনে বউ লজ্জাবতী লতার মত ঝুঁকে পড়ে। দেবর বিষ ছাড়াতে এলে বউয়ের হাসি পায়। স্বামী দেবতা একবার বিষ ছাড়াতে আসুক না--দেখব মজা। গানের কথায় এদের এই গ্রাম্য জীবনযাত্রা যেন স্পর্শ করা যায়। যেমন ছন্দ, তেমনি তান ও লয় । অন্য এক গানের কলি-- স্বামী চলে যাবে দূরদেশে। প্রিয়তমা বউ বলছে, পশুরা সারাদিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আসে, কিন্তু স্বামীকে দেখলে মনে হয় পশুদের চেয়েও অধম। অন্য গানটা পরিচিত--কেসরীয়া বালম্ আয়োনী, পধারো মারো দেশ ... গানের সেই সুর বাজছিল কানে সমস্ত জয়সলমের-এর পরিবেশটা বশিষ্ঠকে আজ যেন মাতিয়ে তুলল । দিল্লীর আজ এই মেঘলা দিনে এদের কথা ভাবছিল, মনে হল যেন আঁকার মধ্যে সেইসব পুরনো স্মৃতিকে আবার স্পর্শ করতে পারবে। চা খেতে বড় ইচ্ছে করছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হরিপদকে ডাকল --- হরিপদ, এক কাপ চা করে নিয়ে আয়। জল রঙের প্রথম প্রলেপ পড়ল কাগজে।

এর পর আগামী সংখ্যায়





## অন্য ভারত

### কনককান্তি সরকার

থর মরুভূমির  
নাম শুনেছেন  
তো? থর  
মরুভূমির নাম  
এলেই সঙ্গে সঙ্গে  
মনে আসে  
রাজস্থানের  
নাম। রাজস্থান  
ভারতের পশ্চিমে  
একটি স্থলবেষ্টিত  
রাজ্য। শতদ্র-



সিন্ধু নদী উপত্যকা তথা ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর প্রসারিত বিখ্যাত থর মরুভূমি এই রাজ্যটির অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে। থর মরুভূমি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম মরুভূমি। থর মরুভূমির প্রায় পঁচাশি শতাংশ ভারতে, এবং প্রায় পনেরো পাকিস্তানে অবস্থিত। থর মরুভূমির উত্তরে বহমান শতদ্র নদী, পূর্বে দীর্ঘ আরাবল্লী পর্বতমালা, দক্ষিণে কচ্ছ জলাভূমি এবং পশ্চিমে সিন্ধু নদ দ্বারা সীমায়িত। এর উত্তরে কাঁটারোপময় স্টেপ তৃণভূমির সাথে এটি অনির্দিষ্টভাবে মিশে গেছে। ফলে থর মরুভূমির প্রকৃত আয়তন সংজ্ঞানির্ভর। ছবির চমৎকার জায়গাটি রাজস্থানের খিমসার গ্রাম, যা থর মরুভূমির ভেতরেই পড়েছে।

রাজস্থানের আরেকটি সুন্দর গ্রাম কুলধারা জয়সলমেরের কাছে কুলধারা গ্রামটির অবস্থান। সারি সারি ঘরবাড়ি, পাতকুয়ো, মন্দির, পাথুরে রাস্তা সবই আছে এই গ্রামে, নেই শুধু থাকার লোক। প্রায় ২০০ বছর ধরে এ ভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে রাজস্থানের কুলধারা গ্রাম। সোনার কেল্লার শহর জয়সলমের থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমোজানা যায় থর মরুভূমিতে এই গ্রামের পত্তন হয়েছিল ১২৯১ সালে। জোধপুরের

পালি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরা এখানে বসতি গড়েছিলেন। তাঁরা কৃষি ও ব্যবসায় সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁরা নাকি মরুভূমিতেও গমের ফলন করতে পারতেন। ৮৪টি ছোট ছোট সম্প্রদায়ভিত্তিক গ্রাম মিলেই গড়ে উঠেছিল কুলধারা নগরী। সে সময় প্রায় ১৫০০ মানুষের সমৃদ্ধ জনপদ ছিল কুলধারা। রাজস্থানের চারপাশ মরু অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও কুলধারায় সমস্যা ছিল না। আবহাওয়া ও প্রকৃতি একটু ব্যতিক্রমী ছিল বলা যায়। এই অঞ্চলে শস্যের কমতি ছিল না। পালি ব্রাহ্মণরা মূলত কৃষিকাজে দক্ষ ছিল। ফলে এলাকাটি কৃষি এবং ব্যবসার জন্য বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠে সে সময়। প্রাচীন মন্দির থেকে শুরু করে নিখুঁত নকশায় বানানো বাড়ি এখনও দেখা যায়। ১৮২৫ সাল নাগাদ এক রাতেই কুলধারার অধিবাসীরা স্ত্রফ গায়েব হয়ে যান। কারণ অবশ্য নিশ্চিত জানা যায় না। তবে তার পর আর কখনও নতুন জনবসতি গড়ে ওঠেনি কুলধারায়। কুলধারার আশপাশের অঞ্চলগুলো উন্নত হয়ে গেলেও একই সময়ে যেন থমকে আছে কুলধারা। বর্তমানে ভারত সরকার এই গ্রামকে হেরিটেজ নগরী হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখানে ক’দিন থেকে মরুভূমির রহস্যে ডুব দিতে চাইলে ঘুরে আসুন।





## ইন্দো - ইউরোপ উৎসব ২০২৫ - ভারত আর ব্রিটেন জুড়ে জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি

মাইলের হিসেবে দূরত্ব অনেক। কলকাতা আর লন্ডন। আগেকার দিনে বিদেশ মানেই বলা হত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। আজকের এই প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে 'পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে' মুঠোফোন আর অন্তর্জালে বন্দী। ফলে গঙ্গা আর টেমস পাড়ের রোজকার যোগাযোগ যেন পাশের বাড়ির মত। এভাবেই দুই দেশ জুড়ে চলছে ইন্দো - ইউরোপ উৎসবের প্রস্তুতি।

আগামী এপ্রিলে লন্ডনের রমফর্ডে মেফেয়ার ভেন্যুতে একটুকরো ভারত হাজির থাকবে তার সবটুকু বর্ণ- গন্ধ-স্বাদ নিয়ে। সঙ্গে থাকবে বাংলাদেশের বৈচিত্র্য। গুরুগম্ভীর সেমিনার থেকে বলিউডি গান, বাংলা সাহিত্য থেকে আওধি



বিরিয়ানি, সব বয়সের, সব মেজাজের মানুষের জন্য থাকবে ষোলো আনা বিনোদনের আয়োজন।

আয়োজক দুই সংস্থার কর্ণধারেরা সম্প্রতি গেছিলেন লন্ডন, উৎসবের নেপথ্যের বিষয়গুলি চূড়ান্ত করতে। পিকাসোর

পক্ষে শুভম ও শান্তা দত্ত এবং লুক ইস্ট মিডিয়্যার পক্ষে আশিস পন্ডিত অনুষ্ঠান হল পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন লন্ডনে এই উৎসবের ভারপ্রাপ্ত একে এম মাসুদসহ অন্যান্যরা। আশা করা হচ্ছে, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল উৎসবের দুদিনই অন্তত দেড় হাজার করে লোক সমাগম হবে।



শুধু বাঙালি নন, উৎসব

ঘিরে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য ভাষাভাষী প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও। সিদ্ধান্ত হয়েছে, দিনের বেলা মূলত বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাহিত্য বিষয়ে কনক্লেভে অংশ নেবেন ভারত ও ব্রিটেনের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা।



সন্ধ্যায় থাকবে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুম্বই, কলকাতা ও ঢাকার নামী শিল্পীরা ভরিয়ে দেবেন গানে, কথায়, ছন্দে। এছাড়া চমক সৃষ্টি করতে থাকছে একঝাঁক নতুন প্রতিভা, ভারত ও ব্রিটেনের নানা শহরের এই

প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীরা এরমধ্যেই নজর কেড়েছেন। চোখ ধাঁধানো ফ্যাশন শো'তে উঠে আসবে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা মুখ। এর পাশাপাশি অনুষ্ঠানস্থলে দিনভর চলবে মেলা।

শাড়ি থেকে গয়না, পাঞ্জাবি থেকে খাবার-দাবার, হরেক আয়োজন। থাকছে বইমেলা 'কলকাতা বই বাজার'।র জন্য।

ইন্দো - ইউরোপ উৎসবের বড় আকর্ষণ প্রাক সন্ধ্যা অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল ' ইন্দো - ইউরোপ আইকন অ্যাওয়ার্ড'। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ডস-এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। এই মুহূর্তে প্রাপকদের নাম বাছাই পর্ব চলেছে। নির্বাচক কমিটি একমত হয়ে তৈরি করবে তালিকা।



## ফিরে দেখা (অষ্টম পর্ব)

প্রদীপ গ্রীবাস্তব

এই ফ্রন্ট স্টলের লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, টিকিট কেটে সিনেমা দেখার মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ অনুভব করতাম।



এছাড়াও আরও একটি অন্যতম কারণ হলো, সেই সময়ে বাবার কাছ থেকে যৎসামান্য যে রোজকার হাতখরচ

পেতাম, তাতে করে সপ্তাহে বড়জোর ভালো সিটে বসে, একটির বেশি সিনেমা দেখার ক্ষমতা ছিলনা, এদিকে সিনেমা দেখার অদম্য নেশা, অতএব...

তবে, কাছাকাছি হলে কখনও ভালো সিনেমা এলে, বাবা দোকানের কোন স্টাফের মাধ্যমে দামী টিকিট কেটে হাতে ধরিয়ে দিলে আলাদা কথা।

এমনও হয়েছে যে, বেহালার অশোকা সিনেমা হলে তখনকার বিনোদ খাল্লা অভিনীত একটি সিনেমা দেখার জন্য পরণে হাফপ্যান্ট আর নতুন একটি শার্ট পড়ে ফ্রন্ট স্টলের টিকিটের লাইনে অনেক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর, যখন দারোয়ান এসে হঠাৎ করে সরু গলির টিকিট কাউন্টারের গেট বন্ধ করে দিলেন, সব সিট ফুল বা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে বলে, আমি তারপরও সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।



আচমকা লাইন একেবারে ফাঁকা হতেই, গেটের ভিতরের দারোয়ান আমার দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা করলেন, অর্থাৎ একটি সিটের টিকিট উদ্ধৃত আছে। সেই না দেখেই তো আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই বেশ কিছুটা উঁচু লোহার গেট বেয়ে উঠেই ( কারণ, দারোয়ানের হাতে চাবি থাকলেও আর সে তালা খুলবেনা, সুতরাং... ) একলাফে গিয়ে পড়লাম টিকিট কাউন্টারের গলির মধ্যে। ফলত আমার একেবারে নতুন পড়া শার্টের পিছন দিকটি, গেটের উপরে লাগানো বড় লোহার ফলায় আটকে গেলো ছিঁড়ে।

সে নিয়ে তখন আমার বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই, টিকিট পেয়ে গেছি ব্যস।

আবার ইলোরা হলের কথায় ফিরে আসি।

আগেই লিখেছি যে, ইলোরা হলের মালিক ছিলেন, তৎকালীন রায় পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তি বীরেন রায়। সেইসময় ৭০এর দশকের শেষভাগে, উনি ইলোরা সিনেমা হলের ঠিক সামনের উল্টোদিকের রাস্তায় আরেকটি সাজানো গোছানো বড় সিনেমা হল তৈরী করেন। সেই হলের নাম দিয়েছিলেন ' নটরাজ '।

কিন্তু, সেই হলের উদ্বোধনের ঠিক মুখেই হঠাৎ করে হলের দরজা খোলার আগেই বন্ধ হয়ে গেল কারণ, ওই রায় পরিবারেরই আরেক ভাই, হাইকোর্টে কেস করে হল বন্ধের স্টে অর্ডার এনে ইনজাঙ্কশান জারি করে দিলেন। আসলে, রায় পরিবারের শরিকদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কথায় কথায় কেস করে বা ঠুকে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। ফলে, সেই হল তখন আর সাধারণ দর্শকের সম্মুখে উন্মোচন না হয়ে বন্ধ অবস্থায়ই পড়ে রইলো। দীর্ঘদিন বাদে সেই কেস নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে তুলে নিলেও, সেটি আর নতুন করে খোলেনি। বর্তমানে সেটির একটি ফ্লোর, সাধারণ পাঠাগার হিসেবে খুলে দেওয়া হয়েছে।

বেহালারই আরেকটি পুরাতন হল, ' পুষ্পশ্রী ' র ইতিহাস সম্পর্কে পরে আসছি। তার আগে বেহালার অনতিদূরে চেতলা পার্কের রাস্তায়, সাহিত্যিক বিমল মিত্রের বাড়ির কাছের একটি হলের কথা বলে নিই।

অধুনালুপ্ত এই ছোট সিনেমা হলটির নাম ছিল ' রূপায়ণ '।

এই হলে মূলতঃ হিন্দী ছবিই চলতো। হলটির বহিরঙ্গের সুদৃশ্য কাজ এবং হলের সিঁড়ি দিয়ে মূল প্রবেশপথে ওঠার সামনের দুইদিকে ছিল দুটি পাথরের তৈরী কলসী হাতে জলকন্যা।

এই হলের মালিক ছিলেন আদ্যন্ত খাঁটি একজন বাঙালি। হলের টিকিটের মূখ্য বিশেষত্ব ছিল, টিকিটের গায়ে লেখা সিটের রো এবং ক্রমিক নম্বর। অন্যান্য হলের টিকিটে যেমন লেখা শুরু হতো রো A B C D এবং সিট নম্বর 1-2-3..., এই হলের টিকিটে কিন্তু তাই লেখা থাকতো না।

তার জায়গায় রো বা সারির নম্বর লেখা থাকতো যথাক্রমে অ - আ - ক - খ এবং সিট নম্বর ক্রমানুসারে লেখা থাকতো ১-২-৩-৪...।

যা কিনা শুধুমাত্র কলকাতা কেন, পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও সিনেমা হলের টিকিটেই ছিল না।

এর পর আগামী সংখ্যায়





## বোমাঞ্চে ঘেৰা ইতিহাসেৰ পথে (অষ্টম পৰ্ব)

বাবলু সাহা

দুজনেই হতচকিত অবস্থায় কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিছানার উপরে বসে আছি ওদের দিকে চেয়ে, দরজা হাট করে খোলা। আচমকা পলাশের উপস্থিত বুদ্ধিতে ওর কাছে রাখা জোৱালো হেডটর্চটি অন করে ডিপার মুড়ে দিয়ে সরাসরি ওদের চোখের উপরে আলো ফেলতেই, সবকটি শিয়াল ত্ৰস্ত চমকিত হয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের খোলা জঙ্গলের দিকে দৌড় লাগাতেই, আমি লাফ দিয়ে উঠে কাঠের দরজার খিল আর ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দিয়ে পুণরায় বিছানায় এসে লম্বা দিলাম।

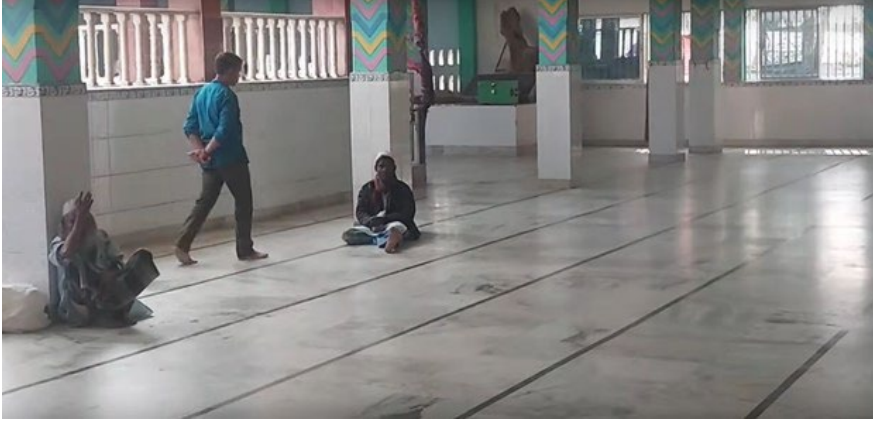


পরেরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে ফ্রেশ হয়ে বাইকটি তখনকার মতো ঘরের সামনের হাতায় রেখে চললাম হিজলী শরীফ দরগার উদ্দেশে। এবার আসি, যে নামে এই ঐতিহাসিক স্থানটি বিখ্যাত, সেই ' হিজলী শরীফ ' দরগার ইতিহাস বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে। এই দরগাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৪০০ সেক্ষুরিতে, সুফি হজরত পীর হজরত শাহ জালাল, লোকমুখে যেটি প্রচলিত " হজুর এ আলা নামে।

মুঘল আমলে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল বড় ব্যবসাস্থল হিসেবে।

এই হিজলী শরীফ পূর্বে একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছিল। এই গ্রামের একদা সুবিখ্যাত জাহাজঘাট, দুর্গ, বাজার এলাকা অনেক আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্তমানে টিকে আছে শুধু সেই সুবিখ্যাত মসজিদ ও মাজার। ১৫১৪ সালে পর্তুগিজরা ওড়িশা উপকূল ধরে হিজলীতে প্রথম এসে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। ১৬২৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের

শাসনকালে, রহমত খাঁ হিজলী দ্বীপে পাঠান রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পাঠান বংশের তাজ খাঁ মসনদ হিজলীকে রাজধানী করেন। হিজলিতে সুদৃশ্য মসজিদটি তারই তৈরী করা। কালের নিয়মে হিজলী দ্বীপ একসময়ে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও, মসনদ ই আলার সেই মসজিদ ও মাজার আজও খেজুরী থানার নিজকসবা গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্য আর হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে বিরাজমান। প্রতিবছর চৈত্র মাসে হিন্দু - মুসলমান ভক্তদের উপস্থিতিতে মসজিদ ও মাজারে এই ' সালে সওয়ার ' বা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। (\*তথ্যসূত্র এবং ঋণ স্বীকার - মেদিনীপুর কথা )



আমরা সোজা চলে এলাম হিজলী শরীফ দরগা চত্বরে। যেহেতু সেদিন শুক্রবার বা জুম্মাবার ছিলনা, সেহেতু এলাকা ছিল বেশ ফাঁকাই। ভিতরে কয়েকজন ভিক্ষুক এবং একজন দরবেশ

ছিলেন। বাইরের ঘেরা চত্বরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি ছোট জলাধার, যেখানে আগত ভক্তরা স্নান করে দরগায় শিল্পি এবং চাদর চড়ান।

মসজিদের ভিতর এবং বাহিরাপ্রের কারুকার্য বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয়। মসজিদের বাইরে সার দিয়ে বাঁধা দোকানপাট, কয়েকটি সাধারণ মানের হোটেল। যেসব দোকানের অধিকাংশই খুরমা, মোরব্বা অথবা বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি এবং



কিছু দোকানে মিষ্টির সাথেই প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন তেল, সাবান, মুদিখানা ইত্যাদির পসরা সাজানো, এছাড়া চত্বরের আশেপাশে সী বীচের কিছুটা আগে অবধি সার দিয়ে প্লাস্টিক, কাঠামোর ছাউনি দেওয়া ছোট বড় দোকান, হোটেল, যেখানে আলাদাভাবে কোন দোকানে তুলনামূলক সম্ভার পোশাক, খুরমা এবং নানারকমের মুসলিম ঘরানার

মিষ্টান্ন, হোটেলগুলোতে সকালের নাস্তা - চা, দপুর ও রাতে বিরিয়ানি, মাছ এবং মুরগির মাংস, সাথে ঠান্ডা পানীয় ও মণিহারি দ্রব্য, চড়ানোর জন্য চাদর পাওয়া যায়।



প্রসঙ্গত, এই স্থানে দরগা এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কঠোর নির্দেশ আছে, এখানে কোনও রকম মুসলিম পরব উপলক্ষে গরু কুরবানী হবেনা। গরুর মাংস খাওয়াও নিষেধ।

যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। এই স্থানের আশেপাশে তো দূরস্থান, নিজকসবা গ্রাম তল্লাটেও একটিও মদের দোকান খুঁজে পাওয়া যাবে না। দরগা চত্বরের মূল প্রবেশপথের বাইরের রাস্তার ঠিক উল্টোদিকের মাঠেই সুসজ্জিত হিন্দু দেব দেবীদের মন্দির, প্রতিবছর মন্দির লাগোয়া মাঠে বড় করে দুর্গাপূজোও হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে হিন্দু মুসলিম একেবারে পাশাপাশি সহাবস্থান। দুই সম্প্রদায়ই একসাথে মিলেমিশে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন। এবং কিছু কাজে সরাসরি যুক্তও থেকে থাকেন। জুম্মাবার এবং দুর্গাপূজোর মেলা একেবারে পাশাপাশি চলে। আর, এখানে অনেক দূর দূরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা আসেন কিছুটা দরগায় শিরনী চড়ানোর উদ্দেশ্যে, এবং বাকিটা সী বীচ দর্শনে।

এনারা ছোট দল বেঁধে বা পরিবার সাথে করে, ভাড়ার গাড়ি বুক করে মোটামুটি তিনদিনের জন্য চলে আসেন এবং নিজেদের বাজার আর রান্না নিজেরাই মনের আনন্দে কিছুটা পিকনিকের মেজাজে করে নেন। এখানকার সব হোটেলই নিজস্ব রান্নার ব্যবস্থা আছে। রান্নার বাসনপত্র সাথে করেই নিয়ে আসেন অথবা এখানেই ভাড়ায় পাওয়া যায়।

এর পর আগামী সংখ্যায়



## গরুমারার জঙ্গলে

### অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

গরুমারার জঙ্গলে  
আমি বেড়াতে গেছি  
বেশ কয়েকবার।  
আসলে ডুয়ার্স আমার  
অত্যন্ত প্রিয় জায়গা।  
তাই প্রত্যেক বছর না  
হলেও, দুই বছরে  
অন্তত একবার আমি  
উত্তরবঙ্গের শোভা  
দর্শনে যাই। আমার  
এই প্রেম শুরু হয়  
১৯৯০ সালে  
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে  
ভর্তি হওয়ার সময়  
থেকে। আমার



গরুমারা প্রথম বেড়াতে যাওয়াও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম বর্ষে থাকার সময়ে এবং সেটাই আমার গরুমারার জঙ্গলের সব থেকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আজ সেই বেড়ানোর গল্পই আপনাদের শোনাব।

সেটা ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকের কথা। সকালে আমি (হাসু), পার্থ (লেদু), সুদীপ (পেডো), কমল, প্রবাল আর বিপ্লব (সোম) কলেজ ক্যান্টিনে বসে আড্ডা মারছি। উত্তরবঙ্গে তখনও শীতের আমেজ কাটেনি। হঠাৎই ঠিক হল, সবাই মিলে গরুমারার জঙ্গলে বেড়াতে যাবো। তখন গুগুল আমাদের জীবনে প্রবেশ করেনি। সুতরাং, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সিনিয়রদের কাছ থেকে পাওয়াই একমাত্র পথ। ক্যান্টিনে



আমাদের পাশে বসে চা খাচ্ছিলো তৃতীয় বর্ষের জিরাফদা (সীতাংশু দা)। জিরাফদাকে আমাদের ইচ্ছের কথা জানাতেই জিরাফদা মুখের সিগারেট থেকে হাওয়ায় একটা ধোঁয়ার গোলক ছেড়ে বললো - আরে হাসু, এ খুবই সোজা। এখান থেকে বাসে করে লাটাগুড়ি চলে যা। ওখান থেকে চালসা যাওয়ার বাস ধরবি। একটু গেলেই গরুমারায় ঢোকান গোট পেয়ে যাবি। আমি জিজ্ঞেস করলাম - রাতে থাকবো কোথায়? জিরাফদা বললো - এমনিতে তো আগে থেকে ফরেস্ট বাংলা বুক করতে হয়। তোরা যখন করিসনি তখন জয় মা বলে বেরিয়ে পড়। ঠিক জায়গা পেয়ে যাবি। আমার পরবর্তী প্রশ্ন - আর খাওয়া-দাওয়া? জিরাফদা বললো - চাল, ডাল, আলু, ফুলকপি, ঘি নিয়ে যা। গভীর জঙ্গলে খিচুড়ি রান্না করে খাবি। এর স্বাদই আলাদা। আর হ্যাঁ, মদিরা নিয়ে যেতে ভুলিস না। মদিরা সেবন ছাড়া জঙ্গলের শোভা কিছুই বুঝবি না। সিনিয়রের আদেশ শিরোধার্য করে সেই দিন বিকেলেই সব বাজার করা হয়ে গেল। ব্রেকফাস্টের জন্য পাঁউরুটি আর কলা কেনাও হল। তারপর আমি, লেদু, পেড্রো, কমল, প্রবাল আর সোম সব জিনিস ছটা ব্যাগে ভরে পরদিন সকালে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে কলেজ ক্যান্টিনে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেলা এগারোটা নাগাদ একটা লাটাগুড়িগামী বাসে উঠে পড়লাম। মনে তীব্র উত্তেজনা। না জানি কত হাতি, গন্ডার, ময়ূর, বাইসন আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী। কন্ডাক্টর টিকিট চাইতেই সগর্বে বললাম, আমরা জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। আমরা কোনোদিন টিকিট কাটি না এবং এক্ষেত্রেও সেই ট্র্যাডিশন বজায় থাকবে। সরকারী বাসের কন্ডাক্টর প্রতিদিন ওই একই রুটে যায়। আমাদের কলেজের প্রতাপ সম্বন্ধে খুব ভালো ভাবেই অবহিত। তাই আচ্ছা বলেই নিজের সিটে গিয়ে বসে পড়লেন। আমরাও সগর্বে আবার গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম। বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা লাটাগুড়ি পৌঁছোলাম। লাটাগুড়ি পৌঁছেই আমরা ওখানকার একটা পাইস হোটেলে জমিয়ে ডাল-ভাত, পোস্তবড়া, বড়ি ভাজা, বোরোলি মাছ খেলাম। খিদের চোটে মনে হচ্ছিলো যেন অমৃত খাচ্ছি। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, বেলা তিনটে নাগাদ চালসা যাওয়ার বাস আছে। আমরা সে বাস ধরতে গিয়ে দেখি যে এত মালপত্র নিয়ে বাসে ওঠার জায়গা নেই। বাস ড্রাইভার বাইরের লোক বুঝতে পেরে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন - কোথায় যাবেন? গরুমারা ফরেস্ট বাংলা বলতেই বললেন - গাড়ি ছাড়া ঢুকবেন কী করে? আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম - হেঁটে। ড্রাইভার বেশ অবাক হয়ে বললেন - তার তো অনুমতি নেই, নিরাপদও নয়। আপনাদের কাছে অনুমতি আছে? আমরা আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললাম - সব আছে। আপনি শুধু যেখান থেকে হেঁটে বাংলা কাছে, সেখানে নামিয়ে দেবেন। তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন - ছাদে বসে যেতে পারবেন? আমরা নতুন রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।



ছজন মিলে বাসের ছাদে লটবহর নিয়ে আমরা চড়ে বসলাম। একটু পরেই বাস ছেড়ে দিলো। কিছুদূর যেতেই শুরু হলো দুপাশে ঘন জঙ্গল। দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে গেছি, হঠাৎ কে যেন হাতে দুম করে একটা লাঠির বাড়ি মারলো। তারপরেই পেছন থেকে কমল বলে উঠলো - এই হাসু, সব কেমন আবছা দেখছি! প্রথমে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা মোটা কালো দাগ আর পাশে পড়ে আছে একটা গাছের ভাঙা ডাল। এরপর কমলের দিকে নজর পড়তেই দেখি-- সর্বনাশ। ওর ওই পেপারওয়ারের মত মোটা চশমার লেন্সের দুটোর মধ্যে একটা ফেটে চোঁচির। তাই ও সবকিছু আবছা দেখছে। এরপরে আমরা বাকি রাস্তা মাথার ওপর গাছের ডাল দেখতে দেখতে এগোলাম। দূরে একজন আদিবাসী গৃহপালিত মোষ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। সেই দেখে প্রায়ান্ধ কমল হঠাৎ আনন্দে বাইসন, বাইসন বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সেই প্রায় ফাঁকা রাস্তায় বাস হঠাৎ থেমে গেল। ড্রাইভার আর কন্ডাক্টরের আওয়াজ পেলাম - আপনারা এখানে নামলেই সুবিধে। আমরাও চটপট নেমে পড়লাম সেই জঙ্গলের মধ্যে। নামতেই বাস ছেড়ে দিলো। ড্রাইভার গলা বার করে বললেন - ডানদিকের ওই সরু রাস্তা দিয়ে চুকে যান। ওই দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘন শালবনের মধ্যে একটা ছোট্ট কাঠের গেট। তাতে লেখা - গরুমারা চেক-পোস্ট, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। যদিও তখন ওই গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনুমতি দেওয়ার মতো কেউ নেই।



তখন সূর্যের তেজ  
কমে আসছে।  
আমরা ছজন  
বীরবিক্রমে ওই  
গেট পেরিয়ে  
লটবহর নিয়ে  
মশমশ করে  
জঙ্গলের মধ্যে  
দিয়ে পায়ে হাঁটা  
সরু রাস্তায় চলতে  
শুরু করলাম -  
এক দঙ্গলে  
জঙ্গলে। চারিদিকে  
শুধু ঝিঁঝির ডাক

আর বিভিন্ন পাখির আওয়াজ। মাঝে মাঝে গাছে গাছে বেজির মতো দেখতে কাঠবেড়ালির

চলার সরসর শব্দ। এগুলোর সঙ্গে আমাদের চলার আওয়াজ আর মদিরার ব্যাগের ভেতর থেকে বোতলের ঠুংঠাং আওয়াজ মিলে এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করছিলো। আমরা সবাই মিলে গান জুড়লাম - আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। আরো মাইলখানেক হাঁটার পর আধোঅন্ধকারে মনে আরো রোমাঞ্চ জাগলো। হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করলাম - এই যে হেথায় কুঞ্জ ছায়ায় স্বপ্ন মধুর মোহে। হঠাৎ রাস্তার বাঁদিকের জঙ্গল থেকে একটা ময়ূর একটু উড়ে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেলো। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। ঘোর কাটতেই আবার হাঁটতে শুরু করলাম। নতুন উদ্যমে সবে শুরু করেছি - হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, হঠাৎ শুনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে অনেকটা ট্রেনের হুইসেলের মতো জোরে আওয়াজ। এই ঘন জঙ্গলে ট্রেন কোথায় - এই কথা যখন ভাবছি, তখন উল্টোদিক থেকে এক ফরেস্ট গার্ড সাইকেল করে আসার সময় আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো-- আপনারা কারা? জঙ্গলে কী করছেন? হাতি বেরিয়েছে, পালান। তখন বুঝলাম ট্রেনের হুইসেলের আওয়াজ আসলে কী! ওকেই জিজ্ঞেস করলাম - কোনদিকে পালাবো? ভদ্রলোক যেদিক থেকে আসছিলো, ঐদিকে হাত দেখিয়ে বললো - দশ মিনিট দৌড়োলেই ফরেস্ট বাংলো পেয়ে যাবেন। এফুনি পালান। বলামাত্র সবাইকে ছেড়ে আমার পাশ দিয়ে তীরবেগে কে সামনে দৌড়োতে শুরু করলো। তাকিয়ে দেখি চশমা-ভাঙা প্রায়ান্ন কমল। আমরাও যে যতটা পারি জোরে দৌড়োতে শুরু করলাম। এর মধ্যেও লেদুর একটাই চিন্তা-- মদিরার বোতল না ভাঙে! মিনিট দশেক পর আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে ফরেস্ট বাংলোর কাছে পৌঁছলাম।

এর পর আগামী সংখ্যায়



## মায়াবী মিশর (প্রথম পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

এবারে পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় সেই নিয়ে কথা হচ্ছিল। এখন তো বেশ আগে থাকতেই সব ঠিক করতে হয়। রবিবার, তাই সবাই ছুটির মেজাজে।

সেই সময়ে ফোন করল পলাশ। পলাশ হল বিখ্যাত ভ্রমণসংস্থা কক্স এন্ড কিঙের একজন ম্যানেজার। খুব ভালো, আর ব্যবহারও দারুণ।



এবারে পুজোয় কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন ? বলল সে। না, এখনও ঠিক করা হয়নি। তাহলে ইজিপ্টে চলুন না। খুব ভালো ট্যুর হবে। ঠিক আছে, কথা বলে জানাচ্ছি।

নীলাঞ্জনা আর রূপকথাকে বলতে তারা তো এককথায় রাজি। আসলে মিশর বা ইজিপ্টের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।

আমি পলাশের সঙ্গে কথা বলে নিলাম।

বাড়িতে খুশির হাওয়া ।

কী মজা, পিরামিড দেখব, মমি দেখব ! বলে উঠল রূপকথা ।

আমাদেরও বেশ আনন্দ হল।

ধীরে ধীরে যাওয়ার সময় এসে গেল। কিছু টাকা ওখানকার মূদ্রা, ইজিপসিয়ান পাউন্ডে পরিবর্তিত করে নেওয়া হল।

দশমীর দিন যাওয়া, কাতার এয়ারলাইন্সের বিমানে। এই সফরে আমাদের ম্যানেজার অভিজিত। সে সবাইকে জড়ো করছিল। কাতারে খানিকক্ষণ হল্ট। কাতার এয়ারপোর্ট একটু ঘুরে দেখা হল। তারপর কানেক্টিং ফ্লাইটে ইজিপ্ট বা যিশর। সেই স্বপ্নের দেশ।

কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোর পর একটা বাসে ওঠা হল। মাঝখানে লাঞ্চ করে নেওয়া হল একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে । সবারই বেশ খিদে পেয়ে গেছিল। খাওয়া ভালোই। খানিক পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে ।



খুব সুন্দর  
হোটেলটা।  
অনেক কটেজ  
রয়েছে ছড়িয়ে  
ছিটিয়ে। আমরা  
চুকে গেলাম  
আমাদের  
কটেজে। হাত  
পা খেলিয়ে  
শুয়ে পড়লাম।  
কিন্তু সে  
বেশিক্ষণের  
জন্য নয়।  
বেরোতে হবে  
লাইট এন্ড

সাউন্ড শো দেখার জন্য।

বাসে করে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একটা বড় মাঠে। সেখানে পরপর বেঞ্চ পাতা রয়েছে। আমরা গিয়ে বসলাম সেখানে। অনেক বিদেশীও রয়েছেন।

একটু পরেই শুরু হল লাইট এন্ড সাউন্ড শো। কিছুটা দূরে রয়েছে তিনটে বড় পিরামিডের মডেল। তাদের ওপরে আলো এসে পড়ছে, আলোর রঙ পরিবর্তিত হচ্ছে। কেমন যেন আলো আঁধারির খেলা। একজন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে বলে চলেছেন। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। এক মায়াবী পরিবেশ। আমরা যন্ত্রমুঞ্জের মত দেখছি আর শুনছি।

শো শেষ হতে উঠে পড়লাম আমরা। সবারই খুব ভালো লেগেছে। এবারে রাতের খাওয়া সারা হল আর এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। তারপর হোটেলে ফেরা।

কটেজে ঢুকে নীলাঞ্জনা বলল, আমার খুব ভালো লেগেছে।  
আমারও। বলল রূপকথা।

এবারে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। কাল যাওয়া হবে আলেকজান্দ্রিয়ায়।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম আমরা। অভিজিত পরিচয় করিয়ে দিল লোকাল ম্যানেজার আহমেদের সঙ্গে। সে বেশ হাসিখুশি আর চটপটে লোক।

সবাই যে যার পরিচয় দিল। বেশিরভাগই বাঙালি। এর মধ্যে গানটান হল। রূপকথাও গান গাইল।

এখন আমরা একটা পরিবারের মত। বলল অভিজিত।

এখানে আসার আগে আমি একটু পড়ে নিয়েছিলাম মিশর সম্পর্কে। মিশরীয় সভ্যতা এক অতি প্রাচীন সভ্যতা। প্রায় পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে নানা মানুষ এসেছিল এই জায়গায়, এখনকার প্যালেস্তাইন, সিরিয়া, লিবিয়া, প্রভৃতি জায়গা থেকে। তাদের মধ্যে কিছু লোক এখানকার উর্বর মাটির আকর্ষণে থেকে যায়। তারা চাষবাস এবং পশুপালন শুরু করে এবং মাটির বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করে। তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী ছিল।

মিশর অবস্থিত আফ্রিকার উত্তর পূর্ব অংশে। এই দেশের এক বড় সম্পদ হল তার নদী, নীলনদ। মিশরের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- ওল্ড কিংডম, মিডল কিংডম



আর নিউ কিংডম। প্রাচীন মিশরের দুটি প্রধান রাজধানী শহর ছিল মেমফিস ও থেবেস। মেমফিস ছিল প্রথম রাজধানী, যা স্থাপন করেছিলেন রাজা মেনেস। থেবেস রাজধানী ছিল মিডল ও নিউ কিংডমের সময়।

প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা মূলত কৃষিকার্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। প্রধান শস্য ছিল গম, এছাড়াও ছিল ফল ও শাকসব্জি। আরও জন্মাত ফ্ল্যাক্স নামক এক ধরনের গাছ, যাতে নীল রঙের ফুল হত, যার থেকে মিশরীয়রা জামাকাপড় তৈরি করত। তাদের রাজাকে বলা হত ফ্যারাও।

এবারে আমরা এসে পৌঁছলাম আলেকজান্দ্রিয়ায় ।

এর পর আগামী সংখ্যায়



## অন্য জগৎ

### নিজস্ব প্রতিনিধি

#### উজানস্রোতের বিজয়ার আড্ডা

আড্ডা শব্দটি বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালি আড্ডা প্রিয় মানুষ। তেমনি একটি ভাবনাকে মাথায় রেখে উজানস্রোত পরিবার এবং এক্সেলার বুকস পাবলিকেশন এর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতা বইপাড়ার দে'জ পাবলিকেশনের নতুন বই ঘরের সেমিনার হলটিতে সংঘটিত হয়ে গেল



'বিজয়ার আড্ডা' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি। উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের নতুন পুরনো সকল সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং কিছুটা মূল্যবান সময় একত্রে অতিবাহিত করা। পূজো সংখ্যায় যে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকাররা তাঁদের লেখার মাধ্যমে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলে আমন্ত্রিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে। আর আমন্ত্রিত ছিলেন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই সকল মানুষ যাদের ছাড়া পত্রিকা অসম্পূর্ণ।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রাথমিক পরিচিতির মাধ্যমে। এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলী সদস্যা মালবিকা চক্রবর্তী। পরবর্তীতে সঙ্খ্যাটিকে আরও সুন্দর করে তোলেন যে সকল কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ছিলেন কবি অলোক বিশ্বাস, কবি নিয়াজুল হক কবি সৌমনা দাশগুপ্ত, কবি প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, কবি

সুদীপ চক্রবর্তী, কবি ধৃতিরূপা দাস, কবি মোনালিসার রেহমান কবি আভা সরকার মন্ডল এবং কবি ও সাহিত্যিক শ্যামল জানা। অনুষ্ঠানটির মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল 'শারদীয় পত্রিকার সেকাল একাল'।

এই সংক্রান্ত আলোচনায় ছিলেন বিধান নগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন ডক্টর অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক ও আলোচক আশিস পাঠক এবং সাহিত্যিক ও অভিনেতা সৌভিক গুহ সরকার।

অনুষ্ঠানটির শেষ পর্যায়ে সুমধুর কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করেন পত্রিকার অনন্য কর্মী বিংশতি বসু।

## **রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার তরফে আনন্দানুষ্ঠান**

সম্প্রতি 'রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা' এলিট-এর উদ্যোগে উত্তর কলকাতার বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের শীতের সরঞ্জাম বিতরণ এবং জাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শেষে সকল শিশুদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ১০



নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরত ব্যানার্জি, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের প্রাক্তন জেলা সদস্য সুদীপ রায় রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা, এলিট-এর প্রেসিডেন্ট অর্চনা ভট্টিকা এবং অন্যান্যরা।

## সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পদযাত্রা

থ্যালাসেমিয়া ও  
এডস্ মুক্ত বিশ্ব  
গড়ার লক্ষ্যে  
সম্প্রতি রবিবারের  
সকালে 'সেরাম  
থ্যালাসেমিয়া  
প্রিভেনশন  
ফেডারেশন'-এর  
উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য  
পদযাত্রার আয়োজন  
করা হয়। সংস্থার  
সম্পাদক সঞ্জীব  
আচার্য নেতৃত্বে ও  
সমাজের সর্বস্তরের



বিশিষ্ট নাগরিক তথা বিভিন্ন ক্লাব-গণসংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। সচেতনতার বার্তা নিয়ে শ্যামবাজার মোড় থেকে শুরু হয়ে উত্তর কলকাতার নানা পথ পরিক্রমা করে গণদেবতার এই পদযাত্রা। পরে সংস্থার প্রাপ্তনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি 'সত্যিকথা' পত্রিকার পক্ষ থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজ-র সামনে সম্বর্ধনা মঞ্চ থেকে পদযাত্রীদের অভিনন্দন জানান পত্রিকা সম্পাদক শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়।



## যোগাযোগ

### ইমেইল

write@banglastreet.online

### ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

### ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

### ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,  
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,  
West Bengal 700064

### ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,  
Road-3 Dhanmondi,  
Dhaka 1205

# বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন